শিল্পনীতির উল্টোরথ কৃষির মূলে কুঠারাঘাত

সরকার নিজের প্রকাশিত রিপোর্টের তথ্য ও উপদেশ মানছে না

অভিজিত গুহ

অসম্পূর্ণ ভূমিসংস্কারের পথ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৯০-এর দশক থেকেই সম্পূর্ণ উল্টোপথে যে যাত্রা শুরু করল তারই গালভরা পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল 'গন্তব্য: পশ্চিমবঙ্গ" বা 'Destination West Bengal' । পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য রাজ্য সরকার এক বিদেশি উপদেষ্টা সংস্থা ম্যাকিনসেকে নিয়োগ করে বসল। 'গন্তব্য: পশ্চিমবঙ্গ' বইটি ম্যাকিনসে রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই লেখা। আশ্চর্যের ব্যাপার, বামপন্থী সরকার বিদেশি সংস্থার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সব সময় লম্বা মিটিং, মিছিল সংগঠিত করে, তারাই ম্যাকিনসেকে ডেকে বসল। অথচ এই কলকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা কি ম্যাকিনসে যে কাজ করল, সেই কাজ করতে পারত না? বইটির পাতা উল্টে গেলে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বিগত ২০ বছর ধরে চমৎকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৪ সালের শিল্পনীতিতে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি সাফল্যের কথা সুন্দর ভাষায় বইটির প্রথম অংশেই বিবৃত। বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৫ বছরে অন্তত ভাল অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে। আর এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে আছে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি। ১৯৯৫-৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার গোটা ভারতবর্ষের উন্নতির হারের চেয়েও যে বেশি একথা বইতে বলা হয়েছে। কৃষিতে, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য বেশ উচ্চমাত্রায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক হারে খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড করেছে। আর এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড়পড়তা ক্রয়ক্ষমতা বেশ খানিকটা বেড়েছে। 'গন্তব্য: পশ্চিমবঙ্গ' বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এলাকা ধরে ধরে কীভাবে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন হবে তার আকর্ষণীয় বর্ণনা আছে। এইসব এলাকার মধ্যে আছে দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, খড়্গপুর, সল্টলেক, ডানকুনি, বানতলা, হলদিয়া, ফলতা ইত্যাদি অঞ্চল। বইয়ের শেষদিকে "দেখুন কারা আছেন" এই শিরোনামে একগুচ্ছ জাপানি বহুজাতিক সংস্থার নাম দেওয়া আছে। এঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। তারপর তিনপাতা জুড়ে আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা বহুজাতিক যে সমস্ত কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের নামের তালিকা রয়েছে। সত্যিই পৃথিবী এখন WBIDC-র ব্রিফকেসে, নাকি পশ্চিমবঙ্গটাই এখন বিদেশি পুঁজিপতিদের সুটকেসের মধ্যে?

শিল্পনীতির প্রভাবে তথাকথিত পিছিয়ে থাকা অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার যে অঞ্চলগুলিকে শিল্পায়নের জন্য বাছা হয় সেগুলি হল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের গ্রামাঞ্চল। এই অঞ্চল দুটিতে শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচুর পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছিল। আজ সিঙ্গুরে যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে অবিভক্ত মেদিনীপুরে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে শিল্পায়নের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমি অধিগৃহীত হয়। কিন্তু ওই জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সে সময় দু-একটি স্থানীয় স্তরে আন্দোলন ও স্থানীয় কাগজে কিছু খবর ও লেখালেখি ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয়নি।

এখন দেখা যাক, অবিভক্ত মেদিনীপুরে জমি অধিগ্রহণের চিত্রটা কীরকম। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় মোট ১৪,৩১৯.৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশেষ করে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার উদারনীতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার কৃষির উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি জেলায় শিল্পায়নের জন্য অনেক বেশি পরিমাণে জমি অধিগ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নতির জন্য অথবা প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা বা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য বামপন্থী সরকারের নজর উদারীকরণের যুগে যে ক্রমেই কমে আসছিল পরিসংখ্যান সেকথাই বলছে।

সরকার শিল্প, পর্যটন ও নগরায়ণের জন্য ব্যাপক হারে জমি অধিগ্রহণ করার ফলে মার খেতে শুরু করে গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন, গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনা ও ভূমি সংস্কার। হলদিয়া বন্দর ও হলদিয়া শিল্পায়ন, কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং তারও পর খড়্গপুর অঞ্চলে পিগ আয়রন কোম্পানির কথা বিধানসভায় উঠেছে। অবিভক্ত মেদিনীপুরের জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে প্রথম তথ্যনিষ্ঠ ও সুসংহত রিপোর্ট তৈরি করেন জেলা প্রশাসন ১৯৯৩ সালে। এই রিপোর্ট অবশ্য কখনও ছাপা হয়নি। এই রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল এককথায় তা রীতিমতো ভয়ানক। রিপোর্টে তদানীন্তন অবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছিল যে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় তখনও পর্যন্ত ২৯৩ টি অসম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণের ঘটনা রয়েছে। যে সমস্ত সরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানির জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই এখন সরকারের তহবিলে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা করছেন না। জমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ওইসব সংস্থা বা কোম্পানিগুলি সম্পূর্ণ নীরব। ফলে যে সব চাষির জমি অধিগৃহীত হয়েছে, তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। তাছাড়া সরকারি তহবিলে টাকা জমা দিতে দেরি করলে সরকারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ জমির দামের উপর প্রথম বছর ৯ শতাংশ এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বাৎসরিক ১৫ শতাংশ হারে সুদ দিতে হয়। এই বাকি টাকার পরিমাণ হল ২৬ কোটি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা বাকি রেখেছে সরকারেরই সেচ দপ্তর। ওদের বাকি রাখা টাকার পরিমাণ ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২০ হাজার ৬০৭ টাকা। এর পরই আসে পূর্ত দপ্তরের নাম। ওরা রাস্তা তৈরি করবে বলে জমি অধিগ্রহণ করিয়ে বসে আছে, অথচ রাস্তা তৈরি হয়নি। ওদের বাকি রাখা টাকার পরিমাণ ৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭৭ টাকা। এরপর আছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, কৃষি বিপণন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের নাম। এছাড়া রিপোর্টের আর এক অংশে বলা হয়েছে, যে সমস্ত সংস্থা টাকা জমা করেনি তাদের মধ্যে অনেকেই অধিগৃহীত জমির উপর বাড়ি তুলে ফেলেছে, অথবা খানিকটা রাস্তা তৈরি করেছে কিম্বা একটা সেচের খাল কেটেছে। এরপর যদি ওইসব প্রকল্পগুলি বাতিল করা হয় তখন ওই জমি তার পুরনো মালিকদের হাতে আগেকার অবস্থায় ফেরত দেওয়া যাবে না। ফলে সরকারি প্রচারে বাইরে থেকে উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি প্রশাসনিক কাজ মনে হোক তার ভেতরের চেহারাটা বড়ই ভয়ঙ্কর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়া শিল্পক্রমের ফলে কৃষিভিত্তিক মূলে আঘাত পড়েছে। নতুন শিল্পনীতির মূল কথা হল পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও কৃষি অগ্রগতির ফলে গ্রামাঞ্চলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন, বিশেষ করে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পায়নের পথে যেতে পারে। এই একটি যুক্তিকে সম্বল করেই বামফ্রন্টের তাত্ত্বিকরা নয়া শিল্পনীতি তৈরি করেন। আজও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওই একই কথা বলে চলেছেন। এঁরা ভুলে যাচ্ছেন ভূমি সংস্কারটাই ঠিকঠাক হয়নি এবং ভূমিসংস্কারের সুফলভোগী পাট্টাদার ও বর্গাদারদের জমি অধিগ্রহণ করলে সেটা হবে একটা আত্মঘাতী প্রক্রিয়া। এতে অল্প কিছু মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য বাড়বে। বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্য শরিক সিপিএম ও মন্ত্রিত্বের লোভে লালায়িত মেজ, ছোট, শরিকরা এই আত্মঘাতী পথটিই বেছে নিয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০০৪ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট সম্পাদনা করেছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জয়তী ঘোষ। রিপোর্টের শেষ অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ পথ কী হতে পারে সে বিষয়ে ২৫ টি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করা যেতে পারে, এই উপদেশগুলির কোনও একটিতেও পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু ভূমিসংস্কারের ফলে সাধারণ কৃষকদের উন্নতি হয়েছে তাই এ রাজ্যে ব্যাপকভাবে ভারী ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এরকম কথা বলা নেই। বরং রিপোর্টে সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে যে বর্গাদার এবং পাট্টাদাররা জমি হারাচ্ছেন সে সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত এই রিপোর্টের ৯ নং উপদেশে বলা হয়েছে, "গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মগুলিকে রাজ্য সরকারের উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে নতুনভাবে সমবায় গড়ে তোলার কথা সরকার ভাবতে পারেন।" (পৃ: ২১৪-২১৫) উন্নয়নের যে মডেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা বামফ্রন্টের রাজনৈতিক দলগুলি আজ দেশবাসীর সামনে হাজির করতে চাইছে তা সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি গবেষণাভিত্তিক রিপোর্টগুলির তথ্যবলি ও উপদেশের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাঁরা 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বলে চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব রিপোর্টগুলি পড়ে দেখুন এবং ভাবুন। শুধু শুধু চেঁচাবেন না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনি।

লেখক রিডার, নৃতত্ত্ব বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়